স্বাস্থ্য সংহিতা

ইনসুলিন : একশো বছর পেরিয়ে এসেও

দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত

রোগের প্রকৃত কার্যকারণ বুঝে ওঠার বহু আগে বাহ্যিক লক্ষণ দেখে মানুষ সেই রোগের নামকরণ করে রেখেছে, ইতিহাসে এমন ঘটনা প্রচুর। যেমন, চামড়া হলদেটে হয়ে যাওয়ার জন্য ফরাসি jaune [হলুদ] থেকে জন্ডিস, সংস্কৃতে পাণ্ডুরোগ; বা কাঁকড়ার নাছোড় কামড়ে-ধরা চরিত্র থেকে ক্যান্সার [ল্যাটিন]; পূতিগন্ধময় জলা এলাকায় প্রাদুর্ভাব বেশি হওয়ায় ম্যালেরিয়া [ইতালি malo aria = মন্দ বাতাস], আবার ভিন্ন লক্ষণকে গুরুত্ব দিয়ে সেই রোগেরই সংস্কৃত নাম কম্পজ্বর।

ডায়াবেটিসের নামকরণও তেমনি হয়ে আছে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতক থেকে। এই গ্রিক শব্দটির অর্থ 'সাইফন'—বহুমূত্রের কারণে এই রোগ মানুষের শরীর থেকে জল টেনে বার করে দিচ্ছে তাই এই নাম। আবার এই মূত্রে অত্যধিক মিষ্টত্ব থাকায় কয়েক শতক পর সুশ্রুত এবং চরক এই রোগের নাম দিলেন মধুমেহ, মূত্রে মধু। আর এরও বহু আগে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ শতকে মিশরীয় প্যাপিরাস পুঁথিতে রয়েছে এই রোগের অন্য আরও নানা লক্ষণের নিখুঁত বর্ণনা। পারসিক চিকিৎসক ও দার্শনিক আভিসেনা (৯৮০-১০৩৭ খ্রিস্টাব্দ) ডায়াবেটিসের লক্ষণ হিসেবে অস্বাভাবিক খিদে এবং চামড়ায় গ্যাংগ্রিন জাতীয় ঘায়ের উল্লেখ করেছেন।

রোগের নাম ডায়াবেটিস

রক্ত বা রক্তরসে দ্রব গ্লুকোজ কোষপর্দা পেরিয়ে কোষের ভিতরে ঢোকে। শক্তির উৎস হিসেবে কোষ এই গ্লুকোজকে ব্যবহার করে। আমাদের খাদ্যে গ্লুকোজ বা শর্করার পরিমাণ বেড়ে গেলে রক্তে গ্লুকোজ বেড়ে যায় এবং সেই সময় দেখা যায় কোষপর্দা বেশি পরিমাণ গ্লুকোজ কোষের মধ্যে গ্রহণ করতে পারছে। আবার এর উলটো পরিস্থিতিতে, মানে খাদ্যে কম শর্করা গ্রহণ করলে কোষ রক্ত থেকে কম পরিমাণ গ্লুকোজ গ্রহণ করে। এই হল স্বাভাবিক অবস্থার কথা।

ডায়াবেটিসে এই ভারসাম্য রক্ষায় গলদ দেখা যায়। তখন রক্তে উপস্থিত গ্লুকোজ আর কোষপর্দার আবরণ ভেদ করে কোষের মধ্যে অবাধে ঢুকতে পারে না; অথবা বলা যায়, কোষ রক্তে উপস্থিত গ্লুকোজের সদ্ব্যবহার করতে পারে না। অথচ আমরা জানি, প্রাণিদেহের ক্ষুদ্রতম একক এই কোষ তার ভেতরে আগত গ্লুকোজ ভেঙেই শক্তি উৎপন্ন করে। এখন সে গ্লুকোজ না পাওয়ায় আমাদের

শরীরের শক্তি উৎপাদন ব্যাহত হবে। কিন্তু শরীর কি সেকথা শুনবে? তার আছে কত রকমের কত বিচিত্র কাজ। যা হোক করে শক্তি তাকে জোগাড় করে দিতেই হবে।

অগত্যা অভাবী কোষ প্রাণের দায়ে তার প্রোটিন আর ফ্যাটের সঞ্চয়ে হাত বাড়ায়। দেহগঠনের কাজে লাগানোর জন্য মাংসপেশী আর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে জমা করে রাখা ছিল যে-প্রোটিন আর ফ্যাট, তা বাধ্য হয়ে ভেঙে ফেলে কোষ তার দৈনন্দিন কাজের শক্তি তৈরি করতে। এ যেন রোজকার রোজগার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ভবিষ্যতে বাড়ি তৈরির উদ্দেশ্যে জমিয়ে রাখা ফিক্সড ডিপোজিট ভেঙে অন্নসংস্থানের মতো দুর্দশা। ডায়াবেটিস রোগীর চেহারা যে দিন দিন রুগ্ন-শীর্ণ হয়ে যায়, তার কারণ প্রোটিন-ফ্যাটের এই অপরিণামদর্শী, নিরুপায় ভাঙন। আর অল্প বয়সেই যারা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত (টাইপ-১) তাদের বাড়বৃদ্ধিও এই জন্যই আটকে যায়।

কোষে গ্লুকোজের পরিমাণ কম হওয়ার আরও এক উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়ে মস্তিষ্কে হাইপোথ্যালামাসের কোষে। শরীরের অন্য অংশের মতো এই কোষের ভেতরেও গ্লুকোজের অভাব ঘটে। এখানের 'ভেন্ট্রো-মিডিয়াল নিউক্লিয়াই'-তেই রয়েছে প্রাণীর খিদে জাগানোর কেন্দ্র (স্যাটাইটি সেন্টার)। এই কেন্দ্র কম গ্লুকোজ পেয়ে মনে করে, শরীরে বুঝি গ্লুকোজের অভাব ঘটেছে। তার পক্ষে তো রক্তে দ্রবীভূত গ্লুকোজের কোষপর্দা অতিক্রমে অপারগতা সম্পর্কে কোনও ধারণা করা সম্ভব নয়। তাই এই কেন্দ্র উদ্দীপিত হয়ে খিদের বোধ বাড়িয়ে দেয়। তার ফল বিপজ্জনক—ডাক্তারবাবুর বারণ এবং বাড়ির লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে ডায়াবেটিক রোগী তাই লুকিয়ে চুরিয়ে কখনও মিষ্টির দোকানে, কখনও ফ্রিজ হাতড়ে তাঁর পক্ষে নিষিদ্ধ খাবার বেমালুম খেয়ে নিচ্ছেন। ফলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ আরওই বেড়ে যাচ্ছে। অথচ কোষের ভেতর তা পৌঁছতে পারছে না। এ যেন উপচে পড়া ভাঁড়ারের দুয়ারে দাঁড়ানো মলিন মুখের ভিখারিটি—রক্তে গ্লুকোজের প্রাচুর্য নিয়ে সবাই চিন্তিত, কিন্তু উপবাসী কোষ তা ব্যবহার করতে পারছে না।

তাহলে এটা স্পষ্ট, যে-রাসায়নিক পদার্থ রক্তের শর্করাকে কোষপর্দা ভেদ করিয়ে কোষের অভ্যন্তরে নিয়ে যায় তার অভাবই ডায়াবেটিসের অব্যবস্থার মূল কারণ। কিন্তু কোন সে-রাসায়নিক? শরীরে কোথায় তার সংশ্লেষ, কোথা থেকেই বা তার উৎপত্তি?

দীর্ঘকাল যাবৎ বিজ্ঞানীদের কাছে এর কোনও উত্তর জানা ছিল না। আর জানা ছিল না বলেই এতকালের চেনা রোগটির চিকিৎসা সম্পর্কে কোনও দিশা ছিল না কারও কাছে। আজ থেকে একশো বছর আগেও ডায়াবেটিস ধরা পড়লে ওষুধ তেমন কিছু ছিল না, শুধু কিছু কঠোর নিয়ম মেনে চলতে হত। কেমন নিয়ম? রক্তে যেহেতু শর্করার পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে, তাই খাবার থেকে তাকে ছেঁটে ফেলতে হবে। মানে চিনি, গুড়, মিষ্টান্ন তো নয়ই, চাল-গমের মতো শস্য, আলু-কুমড়োর মতো সবজি, ফল সবেতেই নিষেধ। বলা হত দৈনিক ৪৫০ ক্যালরির বেশি গ্রহণ করা চলবে না। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই ভয়ানক অপুষ্টি। তারপর রোগ অনিবার্য থাবা বসাত কিডনিতে, যার ওপর রক্ত শোধনের দায়িত্ব। তার ওপর চাপ কমাতে তখন কোপ পড়ত পানীয়ে।

যাদের ছোট বয়স থেকে ডায়াবেটিস (টাইপ-১) তারা এই নির্মম চিকিৎসা সামলে বাঁচতে পারত না বেশিদিন। মধ্য বয়সে শুরু হওয়া ডায়াবেটিস রোগীরও (টাইপ-২) আয়ু দ্রুত কমে আসত। চিকিৎসকরা আফশোস করতেন, কোষপর্দা পার করে দেওয়া সেই রাসায়নিকটি যদি চিনে নেওয়া যেত!

সেই রাসায়নিক—ইনসুলিন

অবশেষে ১৮৮৯ সালে সামান্য আশার আলো দেখা গেল। ঘটনাটি অনেকটা কাকতালীয়। জার্মানির দুই গবেষক অস্কার মিংকফুস্কি এবং জোসেফ ভন মেরিং অগ্ন্যাশয় নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। তাঁরা এক সুস্থ কুকুরের অগ্ন্যাশয় কেটে বাদ দিয়ে দেখলেন তার তেষ্টা এবং প্রস্রাব দুইই অস্বাভাবিক রকম বেড়ে গেছে। অগ্ন্যাশয়ের সঙ্গে রেচনতন্ত্রের কী সম্পর্ক বুঝতে না পেরে দুই বিজ্ঞানী যখন ধাঁধায়, তখন তাঁদের এক সহকারী বিরক্ত হয়ে খবর দিলেন, গবেষণাগারের মেঝেতে থই থই প্রস্রাব শুকিয়ে চ্যাটচ্যাটে হয়ে যাচ্ছে আর তাতে মাছি ভনভন করছে। মিংকফুস্কি আর মেরিং কালবিলম্ব না করে প্রথমে কুকুরটির মূত্র এবং তারপর রক্ত পরীক্ষা করলেন। দুটিতেই গ্লুকোজের মাত্রা অস্বাভাবিক বেশি। বোঝা গেল যাকে এতদিন হজমে সাহায্যকারী উৎসেচকের উৎস বলে মনে করা হত সেই অগ্ন্যাশয়ের আরও গুণ আছে। সে সেই রাসায়নিকটিরও উৎস, যে-রাসায়নিক রক্তে দ্রব গ্লুকোজকে কোষের ভেতরে ঢুকতে সাহায্য করে, কোষ তার থেকে শক্তি তৈরি করে; ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা সামলে থাকে, শরীরের প্রয়োজনীয় গ্লুকোজ বেরিয়ে যাওয়া আটকায়। এতকাল ধরে খুঁজে চলা সেই জাদু রাসায়নিকটির উৎস তাহলে অগ্ন্যাশয়। কিন্তু অগ্ন্যাশয়ের কোথায় সেটি তৈরি হচ্ছে?

বিজ্ঞানীদের মনে পড়ল বছর কুড়ি আগে এক তরুণ জার্মান গবেষক পল ল্যাঙ্গারহ্যান্স অগ্ন্যাশয়ের আণুবীক্ষণিক গঠন নিয়ে এক গবেষণাপত্রে জানিয়েছিলেন, সেখানে পরিচিত অগ্ন্যাশয়-কোষের বাইরে আর এক ধরনের কোষের ঝাঁক রয়েছে। সেই কোষের কী কাজ সে-সম্পর্কে কোনও ধারণা না থাকায় বাইশ বছর বয়সি বিজ্ঞানীর পর্যবেক্ষণ নিয়ে তখন কেউ তেমন মাথা ঘামায়নি। পরিচিত অগ্ন্যাশয়-কোষ পাচক রস তৈরি করে জানাই ছিল, এখন মিংকফুস্কিদের পরীক্ষণের পর বিজ্ঞানীরা বুঝলেন, তাহলে ল্যাঙ্গারহ্যান্স যে-ঝাঁকবাঁধা কোষের সন্ধান দিয়েছিলেন সেখানেই নিশ্চয় রক্তে শর্করার মাত্রা বজায়-রাখা রাসায়নিকটি তৈরি হয় এবং সেখান থেকে ক্ষরিত হয়ে হরমোন হিসেবে রক্তে মেশে। রাতারাতি সেই বিশেষ কোষগুচ্ছের নাম দেওয়া হল 'ল্যাঙ্গারহ্যান্সের দ্বীপপুঞ্জ' বা 'আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্স'। আর সেই হরমোনটির নাম দেওয়া হল প্রথমে 'আইলেটিন', তারপর 'ইনসুলিন', অর্থাৎ দ্বীপ-প্রোটিন (ল্যাটিন insula = দ্বীপ)।

কিন্তু ইনসুলিনের উৎস জানার পরেও এই রাসায়নিকটিকে আলাদা করা যাচ্ছিল না কিছুতেই। যখনই কুকুর বা গবাদি পশুর দেহ থেকে অগ্ন্যাশয় কেটে বার করা হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে তার থেকে নিঃসৃত পাচক রস নিজেরাই অগ্ন্যাশয় কোষের অনেকটা হজম করে ফেলছে; ইনসুলিনের অস্তিত্ব আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ইতোমধ্যে স্প্যানিশ ফ্লু পৃথিবীতে কাঁপন ধরিয়ে কেড়ে নিয়েছে ৫০ মিলিয়ন মানুষের জীবন। এবং বিজ্ঞানীরা স্বীকার করছেন, এই মারি রোখা গেছে ভাইরাসের বিরুদ্ধে মানুষের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠায়; এই রোগ নিরাময়ে তাঁদের গবেষণার কৃতিত্ব প্রায় শূন্য। এখন যদি ইনসুলিন চিনে নেওয়ার পরেও তাকে বহু যুগের পুরনো এক মারণ রোগে প্রয়োগ করা না যায় তাহলে তো চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মুখ দেখাবার জায়গা থাকবে না!

এমন সময় টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিদ্যা বিভাগের প্রধান, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী জন জেমস রিকার্ড ম্যাকলাউডের কাছে এলেন কানাডার এক তরুণ শল্যচিকিৎসক ফ্রেডেরিক বান্টিং। মাত্র বছর পাঁচেক

হল তিনি মেডিক্যাল কলেজ থেকে বেরিয়েছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশের সেনাবাহিনীতে কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করে ব্রিটিশ সরকারের মিলিটারি ক্রশ লাভ করেছেন। তারপর সার্জারিতে পসার তেমনভাবে জমাতে না পেরে টরন্টোর এক মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষকতা করছেন আর ইনসুলিন নিয়ে পড়াশোনা করছেন। ৩১ অক্টোবর ১৯২০ রাত দুটো নাগাদ তিনি এমন এক স্বপ্ন দেখেন যাতে তাঁর মনে হয়, তিনি স্তন্যপায়ী প্রাণীর অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন পৃথক করতে পারবেন।

কী করে? বান্টিং এক আপাতসরল পরিকল্পনার কথা জানালেন অধ্যাপক ম্যাকলাউডকে : প্রাণীটিকে না মেরে যদি তার অগ্ন্যাশয়ের পাচক রস পরিবহনকারী সব নালিকে বেঁধে দেওয়া যায় তাহলে কিছু সপ্তাহের মধ্যেই বিপরীত প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় অগ্ন্যাশয়ের উৎসেচক উৎপাদনকারী কোষগুলি কাজ না করে করে অকেজো হয়ে যাবে, কিন্তু হরমোন ক্ষরণে কোনও নালির প্রয়োজন না থাকায় ইনসুলিনের উৎস যে-ল্যাঙ্গারহ্যান্স দ্বীপপুঞ্জের কোষগুলি, সেগুলি সতেজ থাকবে। এবার কুকুরকে অপারেশন করে অগ্ন্যাশয় বার করে নিলে তার থেকে ইনসুলিন পাওয়া যাবে, পাচক রস এসে আর গুলিয়ে দেবে না। সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এক গবেষকের কথা শুনে পোড়খাওয়া শারীরবিজ্ঞানী ম্যাকলাউডের প্রত্যয় জন্মাল। তিনি বান্টিংকে গবেষণাগারে যথেষ্ট জায়গা দিলেন, দশটি কুকুর দিলেন আর সহকারী হিসেবে এক ছাত্রকে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। দুই সহপাঠী এডওয়ার্ড ক্লার্ক নোবল এবং চার্লস বেস্ট নিজেদের মধ্যে টস করে ঠিক করলেন বান্টিং-এর সহকারী হবেন বেস্ট। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ১৯২১-এর গ্রীষ্মে বান্টিং কাজ শুরু করলেন।

দেখা গেল, বান্টিং-এর পরিকল্পনা একেবারে নিখুঁত। কয়েক মাসের মধ্যেই কুকুরের কর্তিত অগ্ন্যাশয় থেকে তাঁরা ইনসুলিন পৃথক করে ফেললেন। বিভাগের অন্যান্যরা যতই সেই নির্যাস দেখে 'ঘন খয়েরি বিষ্ঠা' বলে নাক সিঁটকোন, সেটি প্রয়োগ করেই বান্টিং এবং বেস্ট একটি ডায়াবেটিসে মুমূর্ষু কুকুরকে সুস্থ করে তুললেন। তার রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা স্বাভাবিক হল। ৭০ দিন পর নির্যাসের ভাঁড়ার শেষ হল আর কুকুরটিও মারা গেল।

চারদিকে সাড়া পড়ে গেল। স্কটল্যান্ড গিয়েছিলেন ম্যাকলাউড। ফিরে এসে সব শুনে তিনি নিজে গবেষণার হাল ধরলেন। সহকারী হিসেবে নিয়ে এলেন তাঁর সহকর্মী রসায়নবিদ জে বি কলিপকে। কলিপ কুকুর ও গবাদি পশুর অগ্ন্যাশয় থেকে সংগ্রহ করে আনা ইনসুলিন পরিশোধন করলেন। বাছা হল লিওনার্ড টমসন নামে টাইপ-১ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত কানাডার এক ১৪ বছরের বালককে, খাওয়ার নিয়মকানুন মেনে তার ওজন দাঁড়িয়েছে তখন ২৯ কিলো ৫০০ গ্রাম। ১১ জানুয়ারি ১৯২২ তার ওপর পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করা হল কুকুরের ইনসুলিন। টমসনের সামান্য অ্যালার্জি দেখা গেল, ছুঁচ বেঁধানোর জায়গায় একটু পুঁজ জমল। কিন্তু আসল খবর হল, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তার রক্তের ভয়ংকর বেশি মাত্রার গ্লুকোজ বশ মেনে চলে এল প্রায় স্বাভাবিকে। কিছুদিনের মধ্যে তার কিডনিও এল সুস্থতার পথে।

সামাজিক প্রতিপত্তির কারণে টমসনের চেয়েও বেশি প্রচার পেল এলিজাবেথ ইভান্স হিউজ নামে এক ১৪ বছরের বালিকা। তার বাবা নিউ ইয়র্কের গভর্নর, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের এক প্রার্থী। ১৯১৯ সালে এলিজাবেথের টাইপ-১ ডায়াবেটিস নির্ণীত হয়। ১৯২২ সালে যখন তাকে ইনসুলিনের প্রথম ডোজ দেওয়া হচ্ছে তখন খাবারের ভয়ানক বিধিনিষেধ

মানতে মানতে তার ওজন দাঁড়িয়েছিল ২০ কিলো ৪০০ গ্রামের কাছাকাছি। তারপরের পরিবর্তন শুধু স্বপ্ন। আমেরিকার প্রথিতযশা চিকিৎসক ফ্রেডরিক আলেন এই পরিবর্তন প্রসঙ্গে বলেছিলেন, যেন প্রাচীন বেলজিয়াম এলাকার চিত্রকলা, যেখানে মন্বন্তরের পর নবজন্ম দেখানো হচ্ছে।

ইনসুলিন আবিষ্কার সারা বিশ্বে এমন এক স্বস্তির বাতাবরণ তৈরি করে যে মাত্র এক বছরের মাথায় সুইডিস আকাডেমি বান্টিং এবং ম্যাকলাউডকে ১৯২৩ সালের নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করেন। বান্টিং খোলাখুলি জানান, বেস্টকেও এই পুরস্কারের শরিক করা উচিত ছিল এবং তিনি তাঁর পুরস্কার-অর্থমূল্যের অর্ধেক বেস্টের সঙ্গে ভাগ করে নেন। এই সৌজন্যের পথে ম্যাকলাউডও পিছিয়ে থাকেননি, তিনিও তাঁর অংশ সহকর্মী কলিপের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন।

ইনসুলিনের জন্য আমেরিকান পেটেন্ট যৌথভাবে লাভ করলেন বান্টিং, বেস্ট এবং কলিপ। বাণিজ্যিক উৎপাদনের মাধ্যমে ইনসুলিন যাতে এবার সাধারণ রোগীর নাগালে পৌঁছে যায়, তার জন্য মহানুভব এই তিন বিজ্ঞানী মাত্র এক ডলারের বিনিময়ে এই পেটেন্টের অধিকার টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়কে হস্তান্তরিত করেন।

ইনসুলিনের রকমসকম

আমরা জানতে পারলাম, রক্তে দ্রবীভূত গ্লুকোজকে কোষপর্দা পার করিয়ে দিয়ে কোষের অভ্যন্তরে তার সদ্ব্যবহার সুনিশ্চিত করে ইনসুলিন। যখন রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যায়, ধমনীবাহিত সেই রক্ত পৌঁছে যায় অগ্ন্যাশয়ের কোষে, আর অমনি সেখানে ইনসুলিনের উৎপাদন বেড়ে যায়। আবার ঠিক উলটো ক্ষেত্রে, মানে ধমনীতে যখন অপেক্ষাকৃত কম গ্লুকোজ-ঘনত্বের রক্ত প্রবাহিত হয় তখন প্রয়োজন বুঝে অগ্ন্যাশয়ের কোষ ইনসুলিন ক্ষরণে সাময়িক ঢিলে দিয়ে দেয়। সুতরাং রক্তে গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণের কলকাঠি ইনসুলিনের হাতে। তাই ইনসুলিনের অভাবই ডায়াবেটিসের কারণ।

কিন্তু ইনসুলিনের অভাব ঘটছে কেন?

একটি কারণের কথা স্বাভাবিক বুদ্ধিতেই আন্দাজ করা যায়: অগ্ন্যাশয়ের 'আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্স' কোষে কোনও গলদ। মানে, শরীরের মধ্যে ইনসুলিন তৈরিতেই গলদ। প্রকৃতপক্ষে কমবয়সিদের যে-ডায়াবেটিস (টাইপ-১) তার কারণটা অনেকটা এইরকম। জন্তুদের অগ্ন্যাশয় পরীক্ষামূলকভাবে কেটে ফেলে শরীরে ইনসুলিন-শূন্য যে-অবস্থার সৃষ্টি করা হয়, মারাত্মকভাবে আক্রান্ত কিছু শিশুর অবস্থা প্রায় সেরকম ভয়াবহ হয়। কেন এত অল্প বয়সে বা জন্মাবধি অগ্ন্যাশয় এমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তার পেছনে বিজ্ঞানীদের নানান ধারণা আছে। কেউ বলেন, এটি এক ধরনের ভাইরাস সংক্রমণের ফল, কেউ বলেন এটি এক জিন-বাহিত অস্বাভাবিকত্ব, কেউ বা বলেন এর পেছনে রয়েছে 'অটো-ইমিউনিটি' ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু ডায়াবেটিসে বেশি ভোগেন তো বয়স্ক মানুষেরা। তাঁদের ক্ষেত্রে কী অসুবিধে ঘটছে?

দেখা গেছে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস কোষের কার্যক্ষমতা কমে আসে, ফলে কমে যায় ইনসুলিন উৎপাদনের হারও। তবে সবসময় যে এটিই কারণ তা নয়। বয়স্ক, মোটাসোটা অনেক মানুষের রক্তে দেখা যায় ইনসুলিনের মাত্রা স্বাভাবিক বা স্বাভাবিকের থেকে বেশিই রয়েছে, তা সত্ত্বেও তাঁরা ডায়াবেটিসে ভুগছেন। কেন? দেখা যাচ্ছে অতিরিক্ত শর্করা জাতীয় মিষ্টি খাবার দীর্ঘদিন ধরে খাওয়ার ফলে, অথবা কোষে অতিরিক্ত ফ্যাট জমা হওয়ার ফলে প্রান্তিক ইনসুলিন গ্রাহকগুলি (রিসেপ্টর) তাদের

সংবেদনশীলতা হারিয়ে ফেলে। ফলে ইনসুলিন স্বাভাবিক পরিমাণে থাকলেও তা এই গ্রাহকগুলিকে কার্যকর মাত্রায় উদ্দীপিত করার পক্ষে নেহাতই অপ্রতুল। তাছাড়া অক্সিজেনের অভাব, মারাত্মকভাবে পুড়ে যাওয়া, তীব্র মানসিক অশান্তি ইত্যাদি সময়েও ইনসুলিন ক্ষরণ কমে যায়। ফলে খাদ্যতালিকায় তেমন কোনও হেরফের না ঘটলেও রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে যায়।

ডায়াবেটিস রোগীকে নিয়মিত হাঁটাহাঁটি বা ব্যায়ামের কথা যে বলা হয়, তা-ও ইনসুলিনকে কাজে লাগাবার জন্যই। ব্যায়ামে যে-ইনসুলিন ক্ষরণ বাড়ে তা নয়। বরং কায়িক শ্রমের ফলে প্রাণীর ঐচ্ছিক মাংসপেশীর ওপরে উপস্থিত ইনসুলিন রিসেপ্টরগুলি অধিক সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। তাই রক্তে উপস্থিত অপেক্ষাকৃত কম ইনসুলিনও তখন মাংসপেশীর কোষে বেশি গ্লুকোজ ঢুকিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

চিকিৎসায় ইনসুলিন

রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা স্বাভাবিক রাখা এবং কোষের শক্তি উৎপাদন অব্যাহত রাখার বিষয়ে সর্বময় কর্তৃত্ব যে-ইনসুলিনের তাকে সনাক্তকরণ এবং সফল নিষ্কাশনের পর মানবসভ্যতার উল্লসিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। সেই কারণেই সাফল্যলাভের এক বছরের মধ্যে নোবেল পুরস্কার ঘোষণা। নিউ ইয়র্ক টাইমস ঘোষণা করেছিল, Diabetes, Dread Disease, Yields to New Gland Cure—নতুন গ্রন্থি (অগ্ন্যাশয় একটি গ্ল্যান্ড বা গ্রন্থি) চিকিৎসার কাছে হার মানল ভয়ংকর ডায়াবেটিস।

কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল, চিকিৎসায় ইনসুলিনের কার্যকারিতা সম্পর্কে বড্ড দ্রুত উল্লাস প্রকাশ করা হয়ে গিয়েছিল। একথা ঠিক যে ইনসুলিন ডায়াবেটিস রোগীর রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নাটকীয়ভাবে কমিয়ে আনছে। কিন্তু সে সাময়িক। এমনিতে ট্যাবলেট বা ক্যাপসুলের মধ্যে দিয়ে ইনসুলিন খাইয়ে কোনও লাভ হয় না কারণ পৌষ্টিক নালীর নানা উৎসেচক এই প্রোটিন জাতীয় হরমোনটিকে পুরোপুরি নষ্ট করে ফেলে। শিরার মধ্যে ইনসুলিন প্রয়োগ করে দেখা গেল, তার প্রভাব থাকছে এক ঘণ্টারও কম। তখন সিদ্ধান্ত হল ইনসুলিন প্রয়োগ করা হবে চামড়ার নিচে (সাব কিউটেনিয়াস)। কিন্তু তাতেও টাইপ-১ আক্রান্ত শিশুর শরীরে দিনের মধ্যে বেশ কয়েকবার ছুঁচ ফোটাতে হচ্ছে, তা নাহলে রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়মিত নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। নিয়মিত নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব না হলে ডায়াবেটিস ঘটিত মৃত্যু হয়তো হচ্ছে না, কিন্তু ডায়াবেটিস রোগীর চোখ, নার্ভ এবং কিডনি সংক্রান্ত দীর্ঘস্থায়ী জটিলতার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

তাছাড়া রক্তে চটজলদি গ্লুকোজের মাত্রা কমিয়ে আনা দেখে প্রাথমিক মুগ্ধতা যতই থাক, তার উলটো প্রভাবের কথাও মাথায় রাখা দরকার—সেটি হল রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা হঠাৎ অস্বাভাবিক রকম কমে যাওয়া, যার প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে মস্তিষ্ক আর স্নায়ুতন্ত্রে। মস্তিষ্কের কোষ বা স্নায়ুকোষ তাদের কাজের জন্য শক্তি সংগ্রহ করে গ্লুকোজ থেকেই। এই কোষে আবার গ্লুকোজ সঞ্চয় করে রাখার ক্ষমতাও সীমিত। এখন প্রয়োজনের তুলনায় বেশি ইনসুলিন প্রয়োগ করে ফেললে, অর্থাৎ রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ স্বাভাবিকের থেকে অনেকটা কমে গেলে সবচেয়ে প্রভাব তাই দেখা যায় মস্তিষ্ক আর স্নায়ুতন্ত্রেই। প্রাথমিকভাবে এক অদ্ভুত দুর্বলতাবোধ, মাথা ঝিমঝিম, মনঃসংযোগের অভাব বা অতিরিক্ত খিদের অনুভূতি হয়। এই পর্যায়ে গ্লুকোজ বা মিষ্টি জাতীয় কিছু খাইয়ে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বাড়ানোর চেষ্টা না করা হলে খিঁচুনি বা কোমা পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। রক্তে গ্লুকোজের

এই অভাব (হাইপোগ্লাইসিমিয়া) বেশিক্ষণ চললে মস্তিষ্কের স্থায়ী কোনও ক্ষতি, এমনকী শ্বাসযন্ত্র অচল হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

সুতরাং বান্টিং এবং বেস্ট নিষ্কাশিত ইনসুলিন চিকিৎসাক্ষেত্রে শাঁখের করাতের মতো। রক্তে শর্করার মাত্রা দীর্ঘস্থায়ীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা মুশকিল, আবার সেই মাত্রা অতিরিক্ত নেমে গিয়ে বিপদ ডেকে আনার আশঙ্কাও বিলক্ষণ। তাই ইনসুলিনের কাজে রাশ টেনে রাখার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছিল। ১৯৩৬ সালে সেই ধীরে-কার্যকর ইনসুলিন বাস্তবায়িত হল 'নোভো নর্ডিক' সংস্থার বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে। ইনসুলিনের সঙ্গে প্রোটামিন বা ওই জাতীয় কিছু পলিপেপটাইড যোগ করে শরীরে ইনসুলিন শোষণের গতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ফলে এখন তিন ধরনের ইনসুলিন পাওয়া যায় : দ্রুত, মাঝারি এবং ধীরে ক্রিয়াশীল। প্রয়োজন অনুসারে চিকিৎসকরা এর কোনও একটি, অথবা দুই বা তিনের মিশ্রণ ব্যবহার করে থাকেন।

বান্টিং এবং বেস্ট প্রবর্তিত পথে নিষ্কাশিত ইনসুলিন প্রয়োগ করতে গিয়ে ক্রমে আর এক সমস্যা দেখা দিল। মানুষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা ব্যবহারযোগ্য হল গরু ও শূকরের ইনসুলিন। মানুষের ইনসুলিনের তুলনায় এই প্রোটিন হরমোনের গঠনে কিছু তফাত থাকবেই। তার জন্য এই ইনসুলিন প্রয়োগে অনেকের মারাত্মক অ্যালার্জি হতে শুরু করল। তাছাড়া গরু বা শূকরের ৪.৫৩ টন অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন পাওয়া যেত মাত্র ৪৫০ গ্রাম। শেষ পর্যন্ত ১৯৭৮ সালে মার্কিন বায়ো-টেকনোলজি কোম্পানি জেনেনটেক এবং সিটি অফ হোপ ন্যাশনাল মেডিক্যাল সেন্টার যৌথভাবে রিকম্বিন্যান্ট ডি এন এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানব ইনসুলিন তৈরি করে। ১৯৮২ সালে 'এলি লিলি' কোম্পানি বাণিজ্যিকভাবে এই মানব ইনসুলিন উৎপাদনের অনুমোদন পায়। তার নাম হয় Humulin। ১৯৯৬ সালে বাজারে আসে মানব শরীরে ক্ষরিত ইনসুলিনের প্রায়-প্রতিলিপি 'ইনসুলিন অ্যানালগ'।

রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বিচার করে সেই অনুযায়ী ইনসুলিন প্রয়োগ স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এক পাম্পের পরিকল্পনা শুরু হয় ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি, এই শতকের শুরুতে তার চাহিদা বাড়তে থাকে। প্রায়-নিখুঁত, মহার্ঘ্য এই পাম্প শেষ পর্যন্ত বাণিজ্যিক অনুমোদন পায় ২০১৬ সালে। ২০০৬ সালে 'ফাইজার' (Pfizer) কোম্পানি বাজারে নিয়ে আসে ইনসুলিন ইনহেলার, যদিও এটি বাণিজ্যিকভাবে একেবারেই সফল হয় না।

সফল নিষ্কাশনের পর একশো বছর ধরে ইনসুলিনের এই লম্বা যাত্রাপথ : মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদি ক্রিয়াশীল ইনসুলিন, প্রায় ব্যথাহীন ছুঁচের ইনসুলিন পেন, শরীরে ইনসুলিনের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণকারী মুখে খাওয়ার ওষুধ, অন্য প্রাণীর ওপর নির্ভর না করে জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃত্রিম মানব ইনসুলিন, ইনসুলিন ইনহেলার, স্বয়ংক্রিয় ইনসুলিন পাম্প। নিত্য নতুন আবিষ্কার বিজ্ঞানের সত্যকে দ্রুত বদলে দেয়। চিকিৎসাশাস্ত্রও তার ব্যতিক্রম নয়। রোগের কারণ এবং তার নিরাময়ের হদিশ প্রায় দশকে দশকে বদলে যাচ্ছে। এই অবস্থায় ওষুধের দুনিয়ায় একশো বছর ধরে কোনও ওষুধের প্রাসঙ্গিক থেকে যাওয়া এক অত্যন্ত বিরল কৃতিত্ব। ইনসুলিন তার দাবিদার। নিষ্কাশনের একশো বছর পেরিয়ে এসেও ডায়াবেটিস চিকিৎসায় ইনসুলিন এখনও প্রাসঙ্গিক। আগামী কয়েক দশকেও সেই প্রাসঙ্গিকতা হ্রাস পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। ইনসুলিনের জয়যাত্রা আজও অব্যাহত, অব্যাহত থাকুক আরও বহুদিন।